‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ : ঐতিহাসিক তাৎপর্য

মো. রাফাত আলম মিশু*

সারসংক্ষেপ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ পাকিস্তানপর্বের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সপ্তাহে প্রদত্ত বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মধ্যে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রতিবিম্ব হিসেবে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই আয়োজনের মধ্যে একটি প্রতিবাদী চেতনাও ক্রিয়াশীল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের মধ্যে এ-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর ভেতর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলাভাষী জনতার বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিল। সেই ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে অনুসন্ধান করা এই রচনার উদ্দেশ্য।

১৯৬৩ সালের ২২ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর একটি ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ; তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ’। এটি নিছক একটি আনুষ্ঠানিকতামাত্র ছিল না। ওই সময়েই এই আয়োজন ঢাকা শহরে ও সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। এই কর্মোদ্যাগকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের কাছে দাঁড়িয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালের অবরুদ্ধকর সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাংলা বিভাগের দায়বদ্ধতা ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঠ করা যায়। ‘বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের এক অবিস্মরণীয় অবদান – ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ (মনিরুজ্জামান, ১৯৭৮ : ১২)। সপ্তাহব্যাপী সফল এই আয়োজন সম্পন্ন হবার পর ১৯৬৪ সালে এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৭১) তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের অর্থানুকূল্যে[১] অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু, অনুষ্ঠানসূচি, তিনটি প্রধান বক্তৃতাসহ অন্যান্য বক্তৃতা, আলোচকদের অভিমত, মন্তব্যের খাতা ও পত্রিকার পাতা থেকে বাছাই করা কিছু বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ শিরোনামের একটি সংকলনগ্রন্থ। সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই[২] (১৯১৯-১৯৬৯); সহকারী সম্পাদক হিসেবে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৯৩৭–২০২০) ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (জ. ১৯৩৪) দায়িত্ব পালন করেন।[৩] সংকলনগ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন কালাম মাহমুদ। দাম আড়াই টাকা। উক্ত গ্রন্থে মুহম্মদ সফিয়্যুল্লার সৌজন্যে প্রাপ্ত শিল্পী মূর্তজা বশীর অঙ্কিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রতিকৃতিসহ আলোকচিত্রশিল্পী এম. আজমল হকের তোলা অনুষ্ঠানের ২৭টি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। সংকলনগ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে বারোটি বিভাগের মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগ একটি। এর অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩–১৯৩১)। বিভাগের চারজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজন পড়াতেন সংস্কৃত, একজন বাংলা – তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫–১৯৬৯)। পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে বাংলা বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগ আলাদা হয়ে যায়। স্বতন্ত্র বিভাগ হবার পর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (আনিসুজ্জামান, ২০১৮)। সে-হিসেবে তিনিই বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ। ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ গ্রন্থটির মুদ্রণসংখ্যা একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। অনেক বছর পর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতিহাসের এই দালিলিক সম্পদতুল্য বইটি পুনর্মুদ্রণ করে ঢাকার জাগৃতি প্রকাশনী। প্রচ্ছদ প্রায় একইরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও রং এবং ফন্টে কিছুটা তারতম্য ঘটেছে। মুখবন্ধ লিখেছেন আনিসুজ্জামান – এই বইয়ের সঙ্গে যাঁর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। পুনর্মুদ্রিত বইটি পাঠ করে এর বক্তব্যসমূহ বিশ্লেষণ, ওই সময়কার কর্মতৎপরতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে এই আয়োজনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করা বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য।

এক. ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৫৮-১৯৬৮ জেনারেল আইয়ুব খান ঘোষিত ও ব্যাপকভাবে পালিত ‘উন্নয়নের দশক’ বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানে ‘আইয়ুবি কালো দশক’ হিসেবে চিহ্নিত। সামরিকতন্ত্রের ফলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে রুদ্ধশ্বাস অবস্থার মতো শিল্প-সাহিত্য ও ভাষা-সংস্কৃতির চর্চায়ও সময়টি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্থবিরপ্রায় এবং চ্যালেঞ্জিং। ১৯৪৭-এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের পত্তন ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা-প্রসূত ‘ব্যালট বিপ্লবে’র পর ১৯৫৫ সালে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের আমলে বাংলা একাডেমি স্থাপন, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের

শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি, ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশে রাষ্ট্রের ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু এর বিপরীতে 'আধুনিক মনে ভাষা ও ভাবধারায় এছলামের আদর্শ' প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা (১৯৫৯), অভিন্ন রোমক হরফে বাংলা ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে 'জাতীয় ভাষা' প্রবর্তনের উদ্যোগ (১৯৬০), রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে বাধা প্রদান ইত্যাদি সরকারি তৎপরতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং পূর্ববাংলার জনমানুষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাব ও দুরভিসন্ধি স্পষ্ট করে দেয়। পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন (বিএনআর), পাকিস্তান কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব খানের শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা, লেখকদের নিজের অনুকূলে রাখা এবং তাঁদের অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হতে না দেওয়া।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর পুরো পাকিস্তানে কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক পরিষদ ও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়, রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রশাসন মার্শাল ল রেগুলেশন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৬২ সালের মে মাসে আইয়ুব খান প্রণীত 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র ভিত্তিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা পূর্বপাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল বর্জন করে এবং নির্বাচনের পরে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে '১৯৬২ সালের জুন মাসে সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পাকিস্তানে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বর্তমান শাসনতন্ত্র – মৌলিক গণতন্ত্র-বাতিল এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণ-পরিষদ মারফত নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন' (তফাজ্জল, ১৯৮১ : ১৬৫)। ১৯৬৩ সালেও রাজনীতি ছিল নিয়ন্ত্রিত। ১৯৬২ সালে সীমিত আকারে রাজনীতি চালু হলেও পূর্বতন সামরিক আইন দ্বারাই রাষ্ট্র চলছিল। এই বাস্তবতার মধ্যে শিক্ষিত ছাত্র-তরুণ ও প্রগতিশীল লেখকদের ভেতর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার চেতনা প্রবল হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি মূলত ছিল পাকিস্তানের সরকারি নীতির বিরোধী। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়বাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত স্পষ্ট হতে থাকে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রখরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত আরোপিত ছকে সাধারণ মানুষও যখন নিজ শেকড় থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ইতিহাসের গুরুদায়িত্ব পালন

করেছে কিছু প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রীয় বাধা উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন ও ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা (১৯৬১), গণবিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র-আন্দোলন (১৯৬২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের' আয়োজন (১৯৬৩) এবং পরের বছর ব্যাপক সমারোহে ঢাকায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন (১৯৬৪)। বোঝা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের পাতায় একেকটি সাংস্কৃতিক উদযাপন বিপক্ষ শোষকশক্তির বিরুদ্ধে একেকটি কার্যকর ও শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন সময় ছিল সরকারিভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা অংশের সমর্থন ছিল। 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য সামনে নিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং অনুষ্ঠানসূচি গ্রহণ করেছিল। তখনকার পরিবেশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারের অনুকূল ছিল না। সে অবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এই সপ্তাহের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' গ্রন্থটিকে সেই কালো দশকের অন্ধকার সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটি আলোকোজ্জ্বল শক্তি হিসেবে পাঠ করা সমীচীন। এ-প্রসঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতিবিশ্লেষক সাঈদ-উর রহমানের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

> 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া-জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। এই আগ্রহের কারণ মূলত অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের জন্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্মর্তব্য যে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে-অস্ফূট বিকাশ শুরু হয়েছিল যে-কালে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকালে যে-ছাত্র আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম প্রেরণা ছিল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ (সাঈদ-উর, ২০০১ : ৮৩)।

ওই সময়েই প্রাবন্ধিক আবদুল হক তাঁর দিনলিপিতে লিখছেন:

> এই সপ্তাহ বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আলোচনা-সভাগুলিতে এবং প্রদর্শনীতে প্রভূত লোক-সমাগম হয়েছিল প্রত্যেক দিনই। এতে এই বোঝা যায় যে, এখানকার শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতে অভ্যস্ত হচ্ছে এবং এই সাহিত্য ও ভাষার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করছে। এতে এ প্রদেশের সাহিত্যের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎই সূচিত হচ্ছে। উল্লেখিত সপ্তাহটি বোধ হয় অনেকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে (হক, ২০০৩ : ৩৫)।

সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেন, 'এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহান্বিত, তাঁদেরকে হাতে-কলমে এ ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব পরিচিত করিয়ে দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য' (হাই, ২০২০ : ১৭)। অর্থাৎ এই আয়োজনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংযোগ সাধন। এ-বিষয়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ কী পরিমাণ হবে, সে-সম্পর্কে আয়োজকদেরও হয়ত স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরের অনুচ্ছেদেই তিনি জানাচ্ছেন:

> ২২শে সেপ্টেম্বর এই সাহিত্য সপ্তাহের উদ্বোধন হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সূচনা হল যে, আমাদের সামান্য আয়োজন আর সামান্য রইল না – বলা যেতে পারে, অসামান্য হয়ে উঠল। শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এত বিপুল সমাবেশ যে হতে পারে, তা আমাদের ধারণাতীত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যে কত দরদ, তা আরেকবার প্রমাণিত হল' (হাই, ২০২০ : ১৭)।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, এমন একটি আয়োজন অপরিহার্য ছিল বাংলাভাষীদের জন্য।

দুই. কর্মসূচি ও ঘটনাবলি

আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। মনে হয়, সে-কদিন অনুষ্ঠানস্থলে ঢাকা শহর ভেঙে পড়েছিল। মানুষ যেমন আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, উৎসাহ নিয়ে পাঠ ও সংগীত শুনেছে, তেমনি কৌতূহলের সঙ্গে সাহিত্যের বিবর্তন-বিষয়ে আলোচনায় উপস্থিত থেকেছে। মন্তব্যের খাতা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিপার্শ্বের নাগরিক সমাজের এমন যোগাযোগের ঘটনা আগে বোধহয় দেখা যায়নি' (আনিসুজ্জামান, ২০২০ : ৬)। ধারণা করা হয় প্রতিদিন গড়ে দুই-তিন হাজার হিসেবে সাতদিনে বিশ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছিল। প্রদর্শনীর প্রবেশপথে সেঁটে দেওয়া পোস্টারে সতের শতকের কবি আবদুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' কবিতা থেকে 'যে সব বঙ্গেত জন্ম হিংসে বঙ্গবাণী। সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥' – এই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছের (৬টি) উল্লেখ তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যবাহী ও নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ। এই আয়োজনের সূচিবিন্যাসটি ছিল এরকম : ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ রবিবার সকাল নয়টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কুরআন-পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি। ভাষণ

প্রদান করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। এরপর সকাল দশটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ছিল চারটি বিষয়ের ওপর প্রদর্শনী : ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির বিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার মিলনায়তনে (বর্তমানে নাটমণ্ডল) উদ্বোধনী আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষার বিবর্তন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, বিভিন্ন যুগের কবিদের বিস্তারিত পরিচিতি, বিভিন্ন যুগে বাংলা লিপির রূপ ও বৈচিত্র্য, প্রাচীন পুথি ও দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন যুগের বই সম্পর্কে সাধারণ দর্শক প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। একই দিন দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী অব্যহত থাকে। এরপর বাকি ছয় দিনও দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলে।

উদ্বোধনী দিনের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় 'কবিতা পাঠের আসর'; পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। প্রাচীন কবি কাহ্নপাদ থেকে শুরু করে জসীমউদ্‌দীন পর্যন্ত বিশটি কবিতা পাঠ করা হয়। উল্লেখ্য, একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের একাধিক কবিতা পাঠ করা হয়। একটি একক, অন্যটি সমবেত। ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় ছিল আলোচনা সভা। বিষয় : প্রাচীন বাংলা সাহিত্য; সভাপতি : মুহম্মদ আবদুল হাই; বক্তা : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; আলোচক : ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম এবং সৈয়দ মুর্তাজা আলী। ২৪শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'গদ্য পাঠের আসর'; পরিচালনা করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম। এখানে উনিশ শতকের উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন' থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত উনিশজনের গদ্য পাঠ করা হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় আলোচনাসভা। বিষয় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য; সভাপতি : মুহম্মদ আবদুল হাই; বক্তা : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক; আলোচক : অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'নাটক থেকে পাঠ'; পরিচালনা করেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এই আয়োজনে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', কাজী নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি' এবং শাহাদাৎ হোসেনের 'মসনদের মোহ' নাটকগুলোর অংশবিশেষ পাঠ করা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় তৃতীয় আলোচনাসভা। বিষয় : আধুনিক বাংলা সাহিত্য; সভাপতি : মুহম্মদ আবদুল হাই; বক্তা : অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান; আলোচক : অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সমাপনী দিনের সন্ধ্যায় ছিল 'বাংলা গানের আসর'। এখানে কাহ্নপাদ থেকে শুরু করে সমকালের

জসীমউদ্‌দীন রচিত একুশটি গান একক ও সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। এই পর্ব পরিচালনা করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অর্থাৎ সাতটি সন্ধ্যাকে একদিন সাংস্কৃতিক পর্ব ও পরদিন আলোচনাসভা এভাবে সাজানো হয়। প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।

তিন. বক্তৃতাসমূহের বিষয় ও তাৎপর্য

উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মুহম্মদ ওসমান গণি ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। উচ্চশিক্ষা ও মৌলিক চিন্তার বাহন হিসেবে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার বহুল প্রসার কামনা করেন। একইসঙ্গে বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা ভাষায় প্রথম গবেষণামূলক পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা' (১৯৫৭ থেকে) বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ওসমান গণি তাঁর পদে অবস্থান করার কারণে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কথাগুলো বলেছেন। এই কর্মসূচি প্রণয়নে শুরু থেকেই তিনি এর সঙ্গে ছিলেন।

উদ্বোধনী পর্বে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষণ ছিল নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা বিভাগের ইতিহাস, কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সবিস্তারে তুলে ধরেন। বিভাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাংলা বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিভাগের মতো শিক্ষাদান এ বিভাগেরও প্রধান কর্তব্য হলেও দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে সহায়তা করা এ বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য (হাই, ২০২০ : ৩৮)।

তাঁর বক্তব্যটি তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই, স্বাধীন বাংলাদেশে আরও বেশি প্রযোজ্য। বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র হবার কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা এবং এ-জনাঞ্চলের সংস্কৃতি ও রুচির বিকাশে গুরুদায়িত্ব বর্তায় বাংলা বিভাগের ওপরই।

তাঁর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে এই জনাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্কের প্রাচীনত্ব নির্দেশিত হয়। যেমন তিনি বলছেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' প্রধানত পূর্ব বাংলারই সম্পদ' (হাই, ২০২০ : ৩৯)। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই কারণে যে, এই অঞ্চলের ভূগোল ও রাজনীতি সুদূর অতীত থেকেই যে বাংলা ভাষার অনুকূল ছিল তার প্রমাণ এই নিদর্শন। জলবায়ু ও জীবনযাপন পদ্ধতির আভ্যন্তর উদারতার মধ্যে বেড়ে উঠতে পেরেছিল বাংলার মতো একটি প্রাকৃত ভাষা। তাঁর ভাষণ থেকেই জানা যায়, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বাংলায় বিএ অনার্স ও এমএ কোর্স চালু করা হয় (১৯৩৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও বাংলায় অনার্স চালু করা হয়নি; এমনকি ১৯৬৩ সালেও (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) বাংলায় সরাসরি এমএ ডিগ্রির ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ কতগুলো রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববাংলা আলাদা হয়েছিল। বিভাগ-পরববর্তীকালে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষক যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি অনেক মুসলমান তরুণ শিক্ষক হিসেবে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সত্যগুলো তিনি দ্বিধাহীনভাবেই উল্লেখ করেন। মুহম্মদ আবদুল হাইও ছিলেন ওই বাংলার সন্তান। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েও নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের মধ্যে বসবাস করে সম্ভাবনার অনুসন্ধান করতে থাকেন ভাষা ও সাহিত্যের কর্মীসকল। তাই তাঁর বক্তৃতায় শোনা যায় আশা-জাগানিয়া উচ্চারণ – পাকিস্তানেই বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ – 'ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এ দেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন' (হাই, ২০২০ : ৩৯)। আরও বলেন – 'সুখের বিষয়, পাকিস্তান-পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলা বিভাগের প্রতি সুনজর দিয়েছেন' (হাই, ২০২০ : ৪১)। পাকিস্তান রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যে এ-টুকু বোধহয় না বললে হতো না। তবে এ-ও ঠিক যে, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃতের আধিপত্য ও আরোপণের বিপরীতে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ারে সাহিত্যিক বাংলা ভাষার এক ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) বাংলা ভাষার আলাদা চারিত্র্য তখন থেকেই দৃশ্যমান হতে দেখা যায়। 'বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ' এবং 'বাংলা বিভাগ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রধান (minor) বিভাগ ছিল। তবু এই বিভাগ অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী ছিল' (ফজলুল হক, ২০১৯ : ৩)। যেসব বিভাগে প্রফেসরের পদ ছিল না, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম ছিল, সেগুলোই অপ্রধান বিভাগ বলে অভিহিত হতো। ১৯২১ সালে যা ছিল 'সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগ', ১৯৫০ সালে তা-ই হলো 'বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ'। ওই সময়ে বাংলা বিভাগে

শিক্ষকদের নতুন পদ তৈরি হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, বাংলাকে শাসকগোষ্ঠী অধিক মর্যাদা দিতে চেয়েছে। সংস্কৃতের সাপেক্ষে বাংলা কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিবেচনা ক্রিয়াশীল থাকা অমূলক নয়।

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের সূত্র ধরে – যা ইতিহাসেরই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য – বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ এই ভূখণ্ডে ও তার মানুষের সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক, বাংলা সাহিত্যের বিকাশে এই জনাঞ্চলের অবদানকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। সেই সূত্র ধরে মুহম্মদ আবদুল হাই বলছেন – 'মধ্যযুগের পাঠান আমল থেকে বাঙালি মুসলমানেরা নিয়মিতভাবে বাংলা ভাষায় সাহিত্যসাধনা করে এসেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসগুলোতে তাঁদের সবার নামও উল্লিখিত হয়নি' (হাই, ২০২০ : ৪৩)। এই বক্তব্যেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থানগত বাস্তবতা ও তৎপ্রসূত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অনুসন্ধান করার সুযোগ থাকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম অবদানকে প্রকাশ করাকে সাম্প্রদায়িক বিবেচনা হিসেবে দেখলে, দীর্ঘকাল সেই অবদানকে স্বীকার না করাও সাম্প্রদায়িকতা। ফলে ইতিহাসের সংজ্ঞার্থ মেনেই ধর্মের বিবেচনায় সৃষ্ট পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বয়ানটি এমনভাবে তৈরি হবে সেটাই সঙ্গত। এর বাইরেও বাংলা ভাষার উন্নয়নে কিছু বাস্তব পদক্ষেপের আহ্বান ছিল মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষণে। পরিভাষা সৃষ্টি ও পরিভাষা অভিধান প্রণয়নের বিষয়ে তিনি কথা বলেন। প্রাত্যহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলার সর্বতো ব্যবহারের বিষয়ে তিনি আহ্বান জানান। যদিও তাঁর এই আহ্বান স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও বাস্তবায়ন করা যায়নি। উদ্বোধনী পর্বের প্রধান বক্তা হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ও প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা ও গুরুত্বের দিকটি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলা বিভাগের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। প্রথমবারের মতো তিনিই এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পড়ানোর স্মৃতিচারণ দিয়েই তিনি কথা শুরু করেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে জানা যায় – ১৯২১ সালে সংস্কৃত ও বাংলায় অনার্স শ্রেণির জন্য প্রাচীন বাংলার পাঠ্য বিষয়ে যখন বৌদ্ধগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পাঠ্য হয়নি (শহীদুল্লাহ্, ২০২০ : ৪৮)। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই থেকে জানা গেল, বৌদ্ধগান এই বাংলার সৃষ্টি। আর তার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠটিও প্রথম শুরু হলো এই বাংলারই একটি বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে। এই দুই তথ্যের যুগ্মীভবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। চর্যাপদের ভুসুকু যে বাঙালি কবি ছিলেন, এই সন্ধানও শহীদুল্লাহ্ই প্রথম দেন। তাঁর আলোচনায় মেলে প্রাচীন বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিতর্কের যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান। ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের জন্যও বৌদ্ধগানের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, সে-বিষয়েও ব্যাখ্যা দেন শহীদুল্লাহ্। বর্তমানকালে চর্যাপদ ও প্রাচীন-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যতটা পরিচিত, তখন পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশের) শিক্ষিতজনের মধ্যে এতটা পরিচিত ছিল না। এমনকি 'চর্যাপদ' নামটিও তখন ছিল স্বল্পপরিচিত। সেই পটভূমিতে শহীদুল্লাহ্র প্রবন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্বের আলোচকদ্বয় ও সভাপতির বক্তৃতা ছিল অনেকটাই শহীদুল্লাহ্র বক্তৃতার সম্পূরক। সকলের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ ভূখণ্ড, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের মানুষ।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় 'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন মুহম্মদ এনামুল হক। এনামুল হক নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। প্রথমেই তোলেন সাহিত্যের যুগবিভাগ নিয়ে আলাপ। এখন যে প্রসঙ্গকে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের আলোকে আলোচনা করা হয়, মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৬৩ সালেই পাকিস্তানপর্বের ওই বিশেষ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। ইউরোপের ধর্মনিয়ন্ত্রিত বর্বর মধ্যযুগের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত করার পেছনে যে স্পষ্ট ঔপনিবেশিক আরোপণ ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, এনামুল হক তা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রশ্ন তোলেন – 'ব্যাপার কি অদ্ভুত নয়? এটা আরও অদ্ভুত ঠেকে, যখন ভাবি – মধ্যযুগ হচ্ছে অজ্ঞতার যুগ, বর্বতার যুগ ও কুসংস্কারের যুগ, আর 'চিৎপ্রকর্ষের যুগ' হচ্ছে আলোর যুগ, জ্ঞানের যুগ, জাগৃতির যুগ' (এনামুল, ২০২০ : ৫৮)। অর্থাৎ স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজন মূলত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে সৃষ্ট এবং ক্ষমতার সম্প্রদায়গত রদবদলের সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিধাহীনভাবেই বলেন – 'আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে কোনো যুগ আমি স্বীকার করি না' (এনামুল, ২০২০ : ৫৮)। যদিও ইতিহাসকে বুঝবার জন্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উত্থান-পতন বিবেচনা করা ও যুগবিভাগ স্বীকার করা ছিল প্রচলিত রীতি। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার ফাঁকগুলোকে তিনি চিহ্নিত করেন :

> এখনকার ইতিহাসগুলো যতই সমালোচনা-মূলক হোক না কেন, এগুলো একদিকে যেমন অতীতের প্রতি আধুনিক মনের প্রক্ষেপ, অন্যদিকে তেমনি মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আলোচনা বর্জিত একতরফা রচনা। এ-ইতিহাসের পূর্ণ সার্থকতা নেই (এনামুল, ২০২০ : ৫৯)।

সতর্ক এনামুল হক সাহিত্যের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাঙালিত্বের পরিচয়কে বড় করে দেখতে চান, যেখানে যার যার অবদানটুকু স্বীকৃতি লাভ করবে – 'তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য শুধু হিন্দুর সাহিত্য নয়, এমনকি মুসলমানের সাহিত্যও নয়; এ-সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সম্মিলিত বাঙ্গালীর সাহিত্য' (এনামুল, ২০২০ : ৫৯)। মধ্যযুগেও তিনি দেখেছেন বাংলার রেনেসাঁস বা চিৎপ্রকর্ষ, যখন সাহিত্য কৌলীন্যের আসন ছেড়ে সাধারণের কাতারে এসে পৌঁছেছে, মুসলিমরা লিখতে শুরু করেছে হিন্দু পুরাণ নিয়ে।

কথিত মধ্যযুগকে মুহম্মদ এনামুল হক তিন শাসনামল দিয়ে ভাগ করেছেন : তুর্কি-যুগ (১২০০-১৩৫০); সুলতানী যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) এবং মোগলাই যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)। এই তিন কালেই বাংলা সাহিত্যের যুগলক্ষণ বা প্রবণতাগত স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছেন। যেমন, তাঁর মতে, তুর্কি যুগে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ মানুষের মর্যাদা পেয়েছে। ওই সময়ে সংস্কৃতের দৈব আসন টলে যায়, ফারসি তার স্থান দখল করে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায় নিজ ভূমিতে। এই যুগকে তিনি কোনোভাবেই অন্ধকারযুগ বলতে চান না। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল', রাহুল সাংকৃত্যায়ন আবিষ্কৃত ওই সময়কার চর্যার বিভিন্ন পদ, 'শূন্যপুরাণ', 'কলিমা-জলাল', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা', ডাক ও খনার বচন, 'শেক-শুভোদয়া' ইত্যাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এ-অঞ্চলের প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে ও সাহিত্যচর্চার স্বাভাবিক চিত্রটি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মতো রাধাকৃষ্ণের কাহিনী সংবলিত পুথিপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ এনে মুসলিম শাসনামলে বাংলা চর্চার ধারাবাহিকতা ও স্বাভাবিকতাকে নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, 'বাংলা সাহিত্যের তুর্কি-যুগ প্রধানত ভাষা-গঠনের যুগ' (এনামুল, ২০২০ : ৬২)। চিৎপ্রকর্ষ বা রেনেসাঁসের শুরু এ-যুগ থেকেই। তাঁর পর্যবেক্ষণে, সুলতানি যুগে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, সারদামঙ্গল প্রভৃতি দেব-দেবীর অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় রসুলবিজয় ও গাজি বিজয়ের মতো আজগুবি কাহিনী। এখানে 'অলৌকিক' ও 'আজগুবি' শব্দ-ব্যবহারের সচেতনতার মধ্য দিয়ে এনামুল হকের যুগবিচার ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য উন্মোচনে তাঁর যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মোগলাই যুগকে তিনি বলছেন প্রাক্-ইংরেজ যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এখানে ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও রুচিগত কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে।

বক্তৃতার শেষ অংশ ছিল সাহিত্যের পঠন-পাঠন বিষয়ক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমানের পাঠকদের দূরত্ব ও দূরত্ব অতিক্রমণের বিষয়ে তিনি কথা বলেন। এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর বিঔপনিবেশিক মন। ঔপনিবেশিকতা-দুষ্ট চর্চার

ফলে নিজের অতীত থেকে দূরে সরে থাকাকে তিনি বলেছেন উন্নাসিকতা। উন্নাসিক মানসিকতা বলতে 'পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আঙ্গিকে ঢালাই করা পাশ্চাত্য ভাব-প্লাবিত আধুনিক বাংলা-সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য, আর অন্য যা, কিছুই না – এমন একটা মনোবৃত্তি'কে বুঝিয়েছেন (এনামুল, ২০২০ : ৬৮)। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ঘটানোকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। যেকোনো জাতীয়তাবাদী চর্চা ও বিকাশে এ-দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঈষৎ পরিবর্তন করে আধুনিক ভাষায় পুরোনো সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রকাশকে এই সংযোগ সাধনের একটি উপায় বলে মনে করেন। বক্তৃতা শেষে আলোচকদ্বয় বাংলার ইতিহাসে ও সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিমদের বিজয় ও অবদান নিয়ে যেসব ঔপনিবেশিক কিংবদন্তী চালু আছে, সেগুলো খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন। তবে ওই সময়-পর্বে এই বক্তব্যের মধ্যে সাহিত্যবিচারে 'পাকিস্তানায়ন' ক্রিয়াশীল ছিল কিনা, সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যায় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন সৈয়দ আলী আহসান। আলী আহসান যুগতাত্ত্বিকভাবে আধুনিক যুগের 'আধুনিকতা'কে শনাক্ত করতে চেয়েছেন। অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা ছিল তিনি আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় দেবেন। কিন্তু তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক বিষয় বাদ দিয়ে কেবল কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু কবিতার আলোচনায় আধুনিক সাহিত্যের সমগ্র পরিচিতি প্রকাশ পায় না। তাঁর আলোচনায় সাহিত্যের যুগবিভাগে ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে সাহিত্যে উক্ত যুগের প্রকৃতি বা লক্ষণ আবিষ্কার করা গুরুত্ব পায়। আধুনিক যুগকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী যুগ, মধ্যযুগের সাহিত্যবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বর্তমান যুগের সাহিত্যবৈশিষ্ট্যের তুলনা-প্রতিতুলনা করেছেন। তাঁর মতে, শুধু বিষয় নয়, যুগবিচার করতে হয় বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতি দিয়ে। মধ্যযুগের কবিতা ছিল সমষ্টির কবিতা, মধ্যযুগের আঙ্গিক ছিল সুনির্দিষ্ট, বৈচিত্র্য ছিল বিষয়ের। আর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হচ্ছে আধুনিকযুগের মূল লক্ষণ। আধুনিক শিল্পী ব্যক্তিমানস বা ব্যক্তিসত্তার রূপ উদ্‌ঘাটন করেন, সমষ্টির রূপ নয়। নানা আলোচনার পর এই আলাপগুলো এখন পুরোনো, কিন্তু তৎকালে এই আলাপগুলো ছিল একেবারেই নতুন। 'আধুনিক কালের বিশিষ্টতা হচ্ছে শব্দের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করা। তার ঐতিহ্য অনুসন্ধান করা, তার বর্তমান পরিচয়কে আবিষ্কার করা এবং তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করা' (আহসান, ২০২০ : ৭৬)। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আধুনিক কালে শব্দের সম্ভাবনা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিটি কবিতা তার অনুভূতি বা বক্তব্যের নির্দেশে ছন্দ ও চরণ নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ মনে করেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। কারণ শব্দব্যবহারে মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। একই সঙ্গে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও শব্দকে মধ্যযুগ থেকে বের করে নিয়ে আসার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ করেন :

> বর্তমান মানুষ যুক্তিতে, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় এবং উপলব্ধিতে আপন সময়ের বন্ধনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে – আধুনিক সাহিত্য এই চেতনারই ফল। ... বর্তমান কালে সাহিত্যের সামগ্রী হয়েছে সমগ্র পৃথিবী। তাই যে সত্য সাহিত্যের উপজীব্য, সেই সত্য আঞ্চলিক নয়, বরঞ্চ অঞ্চল অতিক্রান্ত সর্বস্থলের (আহসান, ২০২০ : ৭৬)।

সৈয়দ আলী আহসান সময় ও সমাজের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। আলোচকদের মধ্যে অজিত কুমার গুহ সমকালীন সাহিত্যে অসংলগ্নতার বিষয় তুলে ধরেন এবং মুনীর চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের চর্চায় পাকিস্তান-আমলের কর্মতৎপরতার বিষয়ে কিছু কথা বলেন। প্রসঙ্গত তিনি বাংলা সাহিত্যের মুসলিম লেখকদের অবদানকে অসাম্প্রদায়িক মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করতে চান।

তিনটি বক্তৃতা ও সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে দুইটি প্রবণতাকে স্পষ্টতই চিহ্নিত করা যায় : প্রথমত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূলের দিকে অভিনিবেশ; দ্বিতীয়ত পাকিস্তান ভূখণ্ডে (বর্তমানের বাংলাদেশ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করে। সাংস্কৃতিক পর্বেও অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে মুসলিম রচয়িতাদের কবিতা, নাটক, গান, গদ্যের, বিশেষত কাজী নজরুল ইসলামের রচনার আধিক্য লক্ষ করা যায়। এটা ঠিক যে, পাকিস্তানের নতুনতর বাস্তবতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উৎস সন্ধানের বিকল্প ভাবনা ভাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে বাংলা লাভবানই হয়েছে। প্রত্যেক বক্তা সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে এড়িয়ে বাংলা ও বাঙালিত্বের চেতনার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এই বাংলা ও বাংলার মানুষের শক্তির জায়গাটিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ নিয়ে তৎকালীন ঢাকার প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাসমূহ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদকীয়, সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দৈনিক *আজাদ* ৬ই ও ৭ই আশ্বিন সম্পাদকীয়তে, দৈনিক *সংবাদ* ৪ঠা আশ্বিন সম্পাদকীয়তে এবং ১৪ই আশ্বিন পর্যালোচনা হিসেবে এ-আয়োজনের কথা সবিস্তারে তুলে ধরে। এছাড়া *ইত্তেফাক*, *জেহাদ*, *পূর্বদেশ*, *চিত্রালী*, *PAKISTAN OBSERVER, MORNING NEWS* পত্রিকাগুলো একাধিক দিন এ আয়োজন নিয়ে বিশ্লেষণমূলক খবর, সম্পাদকীয় ও পর্যালোচনা প্রকাশ করে।

পাকিস্তানপর্বে বাংলা ভাষার সংকট ছিল অনেক, আবার সম্ভবনাও ছিল। সংকট ছিল রাষ্ট্রের দিক থেকে, আর সম্ভাবনা ছিল জনমানুষের ভেতর থেকে। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের মতো একটি অ্যাকাডেমিক বিষয়ে জনমানুষের ব্যাপক আগ্রহ, কৌতূহল ও অংশগ্রহণ সেই সম্ভাবনার কথাই বলে। বাংলাভাষী জনগণ তার ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অনুগামী হতে চেয়েছে; সংস্কৃতির শেকড়ের মধ্য থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উৎসমূলের সন্ধান পেয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সংগ্রাম ওই দশকেরই আরেকটু পরে আরও বেগবান হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল একটি ধারাবাহিক আন্দোলন। অনেকগুলো উপাদান মিলে এটি সফল পরিণতির দিকে এগিয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায়, বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ – এই তিনের মিথস্ক্রিয়ায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরি হয়েছে, তার নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ১৯৬৩ (১৩৭০) সালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।

আকরগ্রন্থ

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ : জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

টীকা

১. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করা জরুরি। প্রকাশিত এই সংকলনগ্রন্থের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায় – উক্ত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের মূল আয়োজক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ; পররবর্তী বছর গ্রন্থটি মুদ্রণ করার ক্ষেত্রে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিল। কিন্তু ওই সময়ের সক্রিয় সংস্কৃতিকর্মী ও পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগের শিক্ষক সন্‌জীদা খাতুনের (জ. ১৯৩৩) কাছ থেকে জানা যায় – ওই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি অর্থ-সহায়তা দিয়েছিল 'বিএনআর'। এ-বিষয়ে তিনি প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন :

> পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উদ্যোগগুলো বাঙালিকে 'পাকিস্তানি মুসলমান' হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে নিয়োজিত ছিল। সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন'। ভাষা-সাহিত্য সপ্তাহের উদ্যোক্তারা 'ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' বিষয়ে জেনে বুঝেই অর্থ সহায়তা নিয়েছিলেন তো? (সন্‌জীদা, ২০২১ : ৩৪)

২. মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) এই ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজনে নেতৃত্বসূচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষ-কালের (১৯৫৪-১৯৬৯) পুরো সময় বাংলা বিভাগ পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী কর্মতৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা চাপ সত্ত্বেও তিনি বাংলা বর্ণমালা সংস্কারে সম্মত হননি এবং বাংলা বিষয়ের পাঠক্রম পরিবর্তন করেননি । তাঁর উদ্যোগ ও সম্পাদনায় ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অ্যাকাডেমিক গবেষণামূলক পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন অপঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৩. ব্রিটিশ আমলে ও পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পদের শিক্ষককে অধ্যাপক (Professor) বলে সম্বোধন করা হতো। সেই বিবেচনায় সহকারী সম্পাদকদ্বয়ের দাপ্তরিক পদবি ভিন্ন হলেও উক্ত সংকলনে তাঁদেরকে 'অধ্যাপক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (২০১৮)। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মরণ', *হরপ্রসাদ-শহীদুল্লাহ্ প্রথম স্মারক বক্তৃতা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১লা জুলাই।

আনিসুজ্জামান (২০২০)। 'মুখবন্ধ', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

আহসান, সৈয়দ আলী (২০২০)। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

খাতুন, সন্‌জীদা (২০২১)। *সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম* (সংকলন ও গ্রন্থনা : পিয়াস মজিদ), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ (১৯৭৮)। *বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রহমান, সাঈদ-উর (২০০১)। *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ (২০২০)। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

হক, আবদুল (২০০৩)। *স্মৃতি-সঞ্চয় ১*, (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক), সময় প্রকাশন, ঢাকা।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল (২০১৯)। 'বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ', *হরপ্রসাদ-শহীদুল্লাহ্ দ্বিতীয় স্মারক বক্তৃতা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ই জুলাই।

হক, মুহম্মদ এনামুল (২০২০)। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল (২০২০)। 'ভাষণ', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া) (১৯৮১)। *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, (সম্পাদক : আবদুল হাফিজ), বাংলাদেশ বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল লি., ঢাকা।